পুরশ্রী

প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব

যুবরাজ ভৌমিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গুপ্তিপাড়ার বারজন ইয়ার বা বন্ধু একত্রিত হয়ে বাড়ীর দুর্গাদালানের পুজো বাইরে নিয়ে আসেন। বারজন ইয়ারের এই পুজো বারোইয়ারী বা বারোয়ারী নামে পরিচিত হয়। ১৮২০ সনের মে মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা জানিয়েছেন বছর তিরিশেক আগে গুপ্তি-পাড়ায় বারোয়ারী পুজো আরম্ভ হয়—এই হিসাব অনুয়ায়ী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বারোয়ারী পূজোর শুরু। বারোয়ারী পুজোর প্রায় ১৩৫ বছর পর সার্ব্বজনীন পুজোর সূত্রপাত। বারোয়ারী বারোইয়ার নিয়ে বন্ধুবান্ধবের পুজো, আর সার্ব্বজনীন হচ্ছে হিন্দু অহিন্দু, ধনী নির্ধন সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে এক মণ্ডপে দাঁড় করিয়ে মাতৃ আরাধনা করানো।

সার্ব্বজনীন পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। কেন ইনি সার্ব্বজনীন পুজো শুরু করলেন এ প্রশ্নের উত্তর অতীন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ বসু এই ভাবে দিয়েছেন—"তাঁর নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত ও পল্লীর বর্ধিষ্ণু ঘরে পারিবারিক দুর্গাপূজার আয়োজন হত। তিনি তাঁর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছিলেন এই সব দুর্গাপূজাতে কেউ তার বাড়ীতে গিয়ে দুর্গাপূজা দেখতে যেত না যদি না নিমন্ত্রিত হত। নিমন্ত্রিত না হয়ে দুর্গাপূজায় অপরের বাড়ীতে গেলে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা লাঘব হত বলে মনে করত। যৌবনে যখন তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করতেন, মনে বড় আঘাত পেতেন। সকলের পক্ষে সকলকে নিমন্ত্রণ করাও সম্ভব হত না। এই সামাজিক মনোবৃত্তিটাকে কি করে পরিবর্ত্তন করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতেন।

কলকাতায় কোথাও কোথাও বারোয়ারী দুর্গাপূজা হত। সংখ্যায় খুব অল্প এবং তাও নিজস্ব গোষ্ঠির মধ্যে। এই সব দেখে তিনি চিন্তা করতেন এমন ভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করা উচিৎ যেখানে সকলেই মা দুর্গার আরাধনা করবে নিজের সমস্ত সংকোচ ভুলে গিয়ে, নিজেদের মনে করে সকলে মিলে দুর্গাপূজার আয়োজন করবে সমান অধিকারে। তবেই দুর্গোৎসবের যথার্থ সার্থকতা আসবে।

১৯২৫ সনে সমগ্র বঙ্গে সাম্প্রদায়িক যে দাঙ্গা শুরু হয়, তা থেকে শিক্ষা পেয়ে অতীন্দ্রনাথ বুঝলেন, বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা এবং দুর্বলকে রক্ষা করার শক্তি নেই। বহু আগে থেকেই করার কলকাতার যুবশক্তিকে সংগঠিত করার স্বপ্ন অতীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেই স্বপ্ন স্বার্থক হলো। দেশের ও দশের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৬ সনের ২রা এপ্রিল তারিখে বীরাষ্টমী তিথিতে 'বীরাষ্টমী' উৎসবে কলকাতার যুবক ও বালকদের নিয়ে বিবেকানন্দ রোডে, এখন যেখানে বালিকা শিক্ষা সদন রয়েছে, সেখানে 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' নাম দিয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। এই শরীরগঠনের আখড়ায় প্রথম বছর কমপক্ষে ৫০০ জনকে লাঠি খেলা ও কুস্তি সেখান হয়। ঐ বৎসরই অতীন্দ্রনাথ এই ব্যায়াম সমিতিতেই প্রথম 'সার্বজনীন দুর্গোৎসব' শুরু করেন। এই পূজার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত জাতি, ধর্মের গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা দূর করে সমস্ত মানুষকে এক পূজা মণ্ডপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথের এই চিন্তাকে, এই আদর্শকে হিন্দু সমাজের অধিকাংশ মানুষই সর্ব্বসম্মতিতে গ্রহণ করায় মহাষ্টমীর সকালে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্ব শ্রেণীর মানুষকে একই মণ্ডপে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিতে দেখা গেছে।

প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পুজোয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা পুতুল ও পোষ্টারে প্রদর্শিত হত। পোষ্টারের শিরোনাম থাকতো ১) 'রক্তাম্বুদি আজি করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব স্বাধীনতার ধন' ২) বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' ৩) সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে—প্রভৃতি। এই কারণে এই ঠাকুরকে স্বদেশী ঠাকুর আখ্যা দিয়েছিলেন। 'অতীতের স্মৃতিকথায় শঙ্করী কিঙ্কর দত্ত জানিয়েছেন—"সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধু সার্ব্বজনীন পূজার জন্য নয়, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার যুব সমাজকে শক্ত মেরুদণ্ড নিয়ে ভারত মাতাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা, তার জন্য দরকার হয়েছিল শক্তিপূজা ও শারীরিক ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, দেহকে বলিষ্ঠ ও সতেজ করার জন্য। .....সিমলা ব্যায়াম সমিতি স্বাধীনতা আন্দোলনের, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের পীঠস্থান। এখান থেকেই মহাত্মা গান্ধীর অসহ-যোগ আন্দোলনে সমিতির বহু সভ্যের যোগদান ও কারাবরণ ঘটে! এখান থেকেই বহু বিপ্লবী ব্রিটিশ সরকারের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁদেরও কর্মস্থল সিমলা ব্যায়াম সমিতি। প্রথম সারির বিপ্লবী শরৎচন্দ্র বসু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখার্জী, ৺মাখন সেন ও ৺অমর বসু প্রমুখের কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল এই সমিতি।..এই সমিতির সক্রিয় সভ্য ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায় বিখ্যাত ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলার একমাত্র পরিচালক। যখন Police Commissioner Mr. (টেগার্ট) Teggart এর অত্যাচারে বিপ্লবীদের কর্ম্ম ব্যাহত হচ্ছিল তখন ঠিক হয় যে এই ব্রিটিশ Police Commissioner-কে জগৎ থেকে সয়াতে হবে, তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল নারাণদা, ও ডাঃ

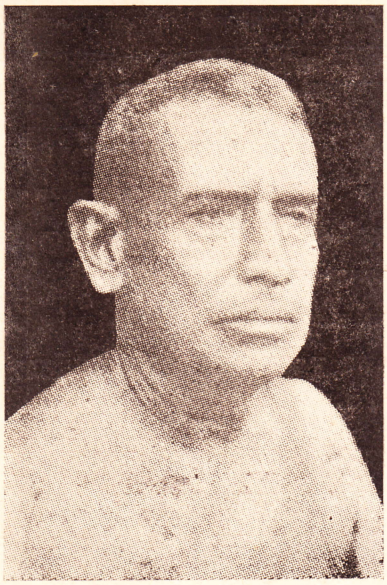

আচার্য্য অতীন্দ্রনাথ বসু
সিমলা ব্যায়াম সমিতি ও সার্ব্বজনীন
দুর্গোৎসবের প্রবর্তক।

ভূপাল বসু। কিন্তু মিঃ টেগার্টের মৃত্যুর তখনও সময় হয় নি কারণ বোমা তার গাড়ীর পিছনে পড়েছিল! অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু কারাবরণ করলেন ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায় ও ডাঃ ভূপাল বসু—সুদূর আন্দামানে। সেই দিনকার কোর্টের রায় শোনবার জন্য আমরা সকলেই জোড়াবাগান কোর্টে গিয়েছিলাম! এই সব কারণে বৃটিশ সরকার সিমলা ব্যায়াম সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করেছিলেন এবং সমিতির যাবতীয় শারীরিক ব্যায়ামের সরঞ্জাম পুলিশ লরী করে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সমিতি পুলিশ কর্তৃক তালা বন্ধ হয়েছিল ও পুলিশ মোতায়েন ছিল সমিতি প্রাঙ্গণে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু সমিতির সার্বজনীন পূজাকে বিপুল ভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন! ১৩৩৫ সনের ২০ অগ্রহায়ণের 'বাংলার বাণী" সাপ্তাহিকে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন—"সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া এবার দুর্গোৎসবের পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিয়াছি। দেখিয়াছি বিরাট জনসমুদ্র, অষ্টপ্রহরব্যাপী অগণিত জনসমাগম। বার বার আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছি কোথা হইতে ইহারা আসে—কেন আসে; খবরই বা কেমন করিয়া পায়? সংবাদপত্রে প্রচারের ঘটা নাই' সভা করিয়া ঘোষণার ডঙ্কা নিনাদ নাই, পথে পথে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই। তথাপি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট এই উৎসবের সংবাদ পৌছাইয়া দেয় কে? কিসের আকর্ষণেই বা প্রচলিত সমাজ বা লোকাচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই সকলে জগজ্জননীর প্রচ্ছন্ন দৃষ্টির নিম্নে সমবেত হইতে ছুটিয়া আসে! উৎসবক্ষেত্র উন্মুখ—সন্তানের আগমনও অবিশ্রান্ত—একদিকে অবারিত দ্বার—আর একদিকে অযাচিত আগমণ। অপরিচিতের আগমনে বিরক্তি নাই. ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণের অভাবে আগন্তুকেরও দ্বিধা বা সংকোচ নাই, পূজাগৃহ যেন সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া যায়। যে সকল স্থানে দলবদ্ধ উপাসনা প্রচলিত তথাকার কয়টি ধর্ম উৎসবে এই বিরাট সার্ব্বজনীন ভাব নিহিত আছে—জানিতে ইচ্ছা করে।"

অতীন্দ্রনাথ বসু যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটি হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একযোগে দাঁড়িয়ে মাতৃ নাম উচ্চারণ করে বর্তমান যুগের রাজসূয় যজ্ঞকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সনের ২রা কার্ত্তিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছেন—"অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে মহাসমারোহে সার্বজনীন দুর্গোৎসব হইয়া গিয়াছে। পূজায় তিন দিন সহস্র সহস্র হিন্দু ছোটবড ভেদ ভুলিয়া সমবেত ভাবে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়াছে এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শক যাইয়া মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছে। অষ্টমীর দিন এত ভীড় হইয়াছিল যে, কয়েকজন মহিলা ও বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে শুশ্রূষা করে। অনেক বালক ও বালিকা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করে।" বাংলাদেশে এই যে ছোটবড ভেদ ভুলে কাতারে কাতারে মানুষের পুজো দেখতে একই প্যাণ্ডেলে এসে মিলিত হওয়া. এদৃশ্য যেমন আশ্চর্য্যজনক তেমনি অভূতপূর্ব!

অন্যান্য পুরনো পূজোর মতো সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমাও এক চালায় গড়া হতো। প্রথম যিনি প্রতিমা তৈরী করেন তার নাম ৺নিতাই পাল। সার্ব্বজনীন পুজো প্রতিষ্ঠা করে অতীন্দ্রনাথ বসু যেমন গোটা হিন্দু সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন. তেমনি ১৯৩৯ সনে অর্থাৎ পুজো প্রতিষ্ঠার ১২

বছর পর প্রতিমা তৈরীতেও নূতনত্ব নিয়ে আসেন। দেবী প্রাচীন বিগ্রহের মতো একই বেদীর উপর থাকতেন কিন্তু পাঁচ জনের জন্য একটি নয়, পাঁচটি চালি তৈরী হল। মাপ দেওয়া হল বেদী পঞ্চাশ ফুট প্রতিমা একুশ ফুট উঁচু। নূতন ভাবের এই প্রতিমা দেখে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত অতীন্দ্র নাথ বসুকে বলেছিলেন—"অতীনবাবু আপনার সাহস আছে, এই ভাবে প্রতিমাকে পৃথক করে গড়লেন, সমালোচনার পাত্র হবেন না ত?" অতীন বাবুর উত্তর—"মার পূজার ধ্যানের কোথায় আটকাচ্ছে?" মহেন্দ্র দত্ত তখন স্বীকার করেন—হ্যাঁ ঠিকই করেছেন, কোন ভুল করেন নি। শুধু তাই নয়। শিল্পী নিতাই পালকে ডেকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে পরে বুঝিয়ে দেন কোনই ভুল হয়নি। বিগ্রহের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাবভাব, রং, পোষাক, অস্ত্র সম্পর্কেও সংস্কৃত শ্লোক বলে শাস্ত্র সম্মত হয়েছে জানান।

প্রতিমার নূতন রূপ দেখতেও পূজা-মণ্ডপে মানুষ ভেঙ্গে পড়েছিল। বহু শিল্পীরও নূতন ভাবের প্রতিমা এসে দেখে গিয়েছিলেন। একবার আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিমা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য—"অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত সুদৃশ্য দেবী প্রতিমা দর্শকগণের চিত্ত ও নয়নকে যুগপৎ মুগ্ধ করে। দেবীর ত্রিনয়ন হইতে যেন অজস্র করুণাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে দেবতাদের যেন বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নাই। অসুর যখন সংগ্রামে সন্ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন ও রক্তাপ্লুত, দেবতারা সেখানে স্মিতহাস্য, নিশ্চিন্ত কিন্তু সংগ্রামশীল ও কৃপাপরায়ণ। শিল্পীর অপূর্ব কৃতিত্ব সমগ্র প্রতিমায় বিকশিত হইয়াছে।" এই বছরই অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে মণ্ডপে অন্নকূটের আয়োজন করা হয়। প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। পুজোর প্রথম পুরোহিত ছিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং তন্ত্রধারকের কাজ করেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

আমরা আগেই বলেছি বারোয়ারী বন্ধুদের অনুরোধে মাকে ফুর্তির আখড়ায় আসতে হয়েছে। হুতোম প্যাচার নক্‌শায় বারোইয়ারী পুজোর উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে কি করে বন্ধুরা ফুর্তির চাঁদা প্রভৃতি তুলতো তার বর্ণনা রয়েছে—"বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হইতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ার দলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও ছেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে ২।১ রৎসরে দস্তুরী বারোইয়ারি খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোছের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাইতাঁর ভার হয়।"

বারোয়ারী পূজোর প্রধান উদ্দেশ্য ফুর্তি। আর সার্ব্বজনীন পুজোর উদ্দেশ্য একাত্মবোধ। সার্ব্বজনীন পুজো প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে সেই তাবনা সার্থক হয়েছিল। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রথম দিকের সেই আদর্শের চিন্তা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে উচ্চাশা পোষণ করতো, সেই সম্পর্কে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন—

স'বাজারের রাজবাড়ীর
পূজা এক সময়ে কলিকাতায়
একটা সর্ব্বসাধারণের উৎসব বলে
গণ্য হ'তো। তিন দিন ধ'রে রাজা নবকৃষ্ণের
ষ্ট্রীটে যে বিপুল জনতা হ'তো তাতে কলিকাতাবাসীর
সঙ্গে অনেক দেশান্তরাগত লোকও যোগ দিত, উৎকৃষ্ট
বাইনাচ ছাড়া কলিকাতায় সে সময়ে দেশী বা বিলাতী
কোন রকম নূতন আমোদের আমদানী হ'লে
রাজারা সর্ব্বসাধারণের উপভোগের
জন্য উহা আপনাদের উৎসব
প্রাঙ্গণে প্রদর্শন করতেন।

—অমৃতলাল বসু

"উৎসবের প্রধান অঙ্গ—সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান। প্রত্যহ আনন্দ বিহ্বল চিত্তে দেখিয়াছি উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়া প্রাসাদ ও কুঠির উচ্চতম বর্ণ ও নিম্নতম বর্ণ এক হইয়া যাইত। পূর্বাহ্নে পুষ্পাঞ্জলি হস্তে যখন শতশত নরনারী পূজা বেদীতে সমবেত হইত তখন সকলের একমাত্র জ্ঞান "আমরা এক জননীর সন্তান"। সকলেরই দৃষ্টি জননীর ভীষণ সৌম্য রূপের করুণানিত নয়নের প্রতি নিবদ্ধ। মধ্যাহ্নে যখন প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সকলে এক পংক্তিতে উপবেশন করিত তখনও দেখিয়াছি সেই একমাত্র জ্ঞান "আমরা এক জননীর সন্তান"। আভিজাত্যের দ্বিধা আসিত না, কৌলিন্যহীণতার কুণ্ঠা জাগিত না, ঐশ্বর্যের অবজ্ঞা বাধা দেয় নাই, দারিদ্রের লজ্জা আসে নাই, জাতি, বর্ণের বা ধর্মের প্রশ্ন ওঠে নাই—সে এক বিরাট সম্মিলন—"আমরা এক জননীর সন্তান।" সেই ভাবের বন্যায় অহিন্দুকেও আপনার ভেদজ্ঞান ভুলিয়া মাতৃপূজায় যোগ দিতে দেখিয়াছি।

যেদিন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দুস্থানের প্রত্যেক সন্তান আপনাকে হিন্দু নামে অভিহিত করিবে এবং বহু ও বিচিত্র

জাতি ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত বিরাট হিন্দুজাতি যুক্ত করে জগজ্জননীর পূজার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইবে সেই দিন দুর্গোৎসবের বিশ্বরূপ মূর্ত্তিমান হইয়া জগৎকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করিবে। সেদিন দুর্গোৎসব বিশাল হিন্দু জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাখাপ্রশাখার বিরাট মিলন ভূমিরূপে পরিগণিত হইবে।''

যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সার্ব্বজনীন পূজোর সৃষ্টি করেছিলেন, আমরা সেই আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছি। এখন বারোয়ারী আর সার্ব্বজনীনের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বারোয়ারীর মতো সার্ব্বজনীনও আজ বারোইয়ারের ফুর্তির জায়গা। যারা সার্ব্বজনীন নাম দিয়ে সস্তা হিন্দী গান চালিয়ে ফুর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন তাদের দেখে ঘৃণা হয়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে এটা সার্ব্বজনীন পুজোর আদর্শ নয়। তোমরা আদর্শ না মানতে পারো কিন্তু তাকে অশ্রদ্ধা জানাবার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা তোমাদের পুজোকে সার্ব্বজনীন না বলে বারোয়ারী বলো, তাতে কারোর কিছু বলার থাকবে না। বারোয়ারী পুজোর ভীড়ে সার্ব্বজনীন বারোয়ারী হয়ে গেছে বলেই আমরা সাধারণে ভুলে গেছি সিমলা ব্যায়াম সমিতির ইতিহাসের সেই স্বর্ণময় যুগের কথা।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু এবং সদস্য শ্রীকালীনাথ দাঁ মহাশয় অনুগ্রহকরে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের (১৩৮২ সাল) স্মারক গ্রন্থ এবং বীরেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু' গ্রন্থটি দিয়ে সাহায্য করায় এঁদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমাঃ প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব